



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 96 - 100

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানের আলোকে সমরেশ বসুর গল্প ‘উরাতিয়া’

মনজিৎ কুমার রাম

গবেষক, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : info.manjitram@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Uratia,
Samaresh Basu,
evolutionary
psychology,
Lakhpati, ghamari,
Fight, mate
selection, male,
strength, women,
mesmerism.

Abstract

Samaresh Basu was a well-known short story writer in Bengali literature. He has been popular for using various life narratives through his writings. ‘Uratia’ is one of them. In the short story Uratia there are two characters, Lakhpati and Ghamari. They have their job to control the railway gate. But that job didn’t bother them. It has only ensured their human-like survival. We would like to convey by this essay that sometimes the psychology of a man may be dominated by their sexual instinct. They live in our worldly environment. But they did not act as our worldly norms. Lakhpati and Ghamari are both muscular men. They always fight. Not for their survival, but they express their manly power by this. In this scenario, in between them, the woman Uratia came. She has the power of mesmerism. Both of them know to fight for proving their bodily strength. But Uratia has some different power. If Lakhpati and Ghamari are the symbols of manliness, then Uratia will be the female way of putting that manliness down.

In this essay we have tried to understand this man-woman dichotomy. We have used evolutionary psychology to decode their behaviours. We have tried to understand how even in this civilised world the man and woman are both using their precivilised instincts.

Discussion

সমরেশ বসুর সমস্ত গল্পের মধ্যে ‘উরাতিয়া’ একটু ভিন্ন স্বাদের গল্প। এই গল্পে কোনো প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বক্তব্য সেভাবে নেই। মানবিক সহানুভূতির বদলে এখানে মানব মনের দু-একটি গোপনচাচী পাশবিক স্বভাবের উন্মোচন ঘটেছে। সমরেশের গল্প-উপন্যাসের প্রেক্ষিতে যে ঘটনা প্রায় বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। সমরেশের অজস্র গল্প-উপন্যাসে তাঁর প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার আঁচ পাওয়া যায়। খুব অল্প বয়স থেকেই পেশাগত কারণে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ গড়ে উঠেছিল। কাজেই সমরেশ যেভাবে তাঁর গল্প-উপন্যাসে সমাজের কেন্দ্রচ্যুত মানুষদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ক্রোধ আর হতাশাকে তুলে ধরেন তা এক রকম নজিরবিহীন। সমরেশের কোনো কোনো গল্পে বিশেষ করে যেন

মানব মনের চাপা পড়া অন্ধকার মূর্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ মানুষ নিজের জাগ্রত মনের অগোচরে যে অন্ধকারকে স্বেচ্ছায় চাপা দিয়ে রাখতে চায় তা কোনো বাহ্য উদ্দীপনার প্রভাবে হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে। আলোচ্য গল্পেও সেরকমই এক নিগূঢ়চারী অন্ধকারের অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ ঘটে যাবার ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য ইতর প্রাণীদের মতো মানুষও লক্ষ লক্ষ বছর ধরে দৈহিক ও মানসিকভাবে বিবর্তিত হয়েছে। নির্মম প্রকৃতির সঙ্গে নিজের দেহ আর মনকে খাপ খাইয়ে নেবার তাগিদে মানুষকেও নানান ধরনের কৌশল আয়ত্ত করতে হয়েছে। তার ফলে চারপাশে নরবানর প্রজাতির নিত্যন্ত সাধারণ গোছের একটি প্রাণী হয়েও মানুষ দু-পায়ে হাঁটতে শিখেছে। তার হাত দুটি ব্যবহার করে সে শিকারোপযোগী পাথরের অস্ত্র বানিয়ে নিতে পেরেছে। আগুন জ্বালানোর কৌশল শিখেছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পেতে পরিচ্ছদ ধারণ করেছে। তারপর কঠিন অধ্যবসায়ে মানুষ তার মনকে শৃঙ্খলিত করেছে। সামাজিক ন্যায়-অন্যায় ও নীতি-অনীতি বোধের মাঝখানে গণ্ডি টেনে দিয়েছে। সেই কারণে ধর্ম, রাজনীতি আর সাংস্কৃতিক আচরণসাম্য মানুষের সহজাত বৃত্তিগুলিকে আজ আটপেঁপেঁ বেঁধেছে। মানুষের পক্ষে এখন ইচ্ছা করলেই সে বাঁধন কেটে বেরিয়ে যাওয়া সহজ নয়। কিন্তু যে সব মানুষ সমাজের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, শ্রেণিগত এবং সংস্কৃতিগত পরিসরের বহিঃপ্রান্তে বসবাস করে তাদের কথা আলাদা। প্রচলিত আদব কায়দায় তারা অভ্যস্ত হবার তেমন সুযোগই পায়নি। যে কোনো কারণেই হোক, সমাজও তাদের থেকে দূরত্ব রক্ষাকেই কর্তব্য মনে করেছে। সেই প্রান্তিক মানুষ যাদের ব্যক্তিত্বে জটিলতা কম এবং যারা জীবনকে একটি সরলরেখা বরাবর দেখতে পায় তাদের কথা সমরেশের 'উরাতিয়া'-র মতো কোনো কোনো গল্পে উঠে আসে। কোনো প্রকারে টিকে থাকা ছাড়া যাদের আর দৈনিক কর্তব্য নেই। তা সত্ত্বেও সমাজ তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। এমনকি সামাজিক বিধিনিষেধ তারা না মানতে চাইলেও না। ঐতিহাসিকদের অভিমত হল, মানুষ কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় প্রবেশ করবার পূর্বে শিকারী-সংগ্রাহক ছিল। কৃষিবিপ্লবের পূর্বে মানুষ কয়েক লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর সর্বত্র আপন পরিবেশ-প্রকৃতি অনুসারে ধারাবাহিকভাবে বিবর্তিত হচ্ছিল। মানুষ নিজের বুদ্ধিমত্তার জোরে আগুন জ্বালানোর কৌশল শিখে নেয় আজ থেকে আনুমানিক দেড় লক্ষ বছর আগে। শুধুমাত্র আগুনের ব্যবহার শিকারি-সংগ্রাহক মানুষকে এক ধাক্কায় বাস্তবত্বের যে উচ্চতায় নিয়ে যায় তা মানব-ইতিহাসের এক অকল্পনীয় ব্যাপার। শিকারী-সংগ্রাহক মানুষেরা সাধারণত ছিল গুহাবাসী। ভ্রমণশীল ছোটো ছোটো গোষ্ঠী গড়ে বসবাস করত। সে কারণে তারা সাধারণত গোষ্ঠীজীবনে অভ্যস্ত ছিল এবং গোষ্ঠীনির্ধারিত নিয়মকানুন মেনে চলত। সে কালে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েই মানুষ যাবাবরের মতো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছে। কোনো স্থানে তাদের বসবাসের স্থায়ীত্ব কিংবা অনস্থায়ীত্ব ছিল খাদ্যের যোগান-নির্ভর। আজ থেকে দশ হাজার বছর পূর্বেও মানুষের মনে কৃষি এবং পশুপালন বিষয়ে দারুণ অজ্ঞতা ছিল। সেই কারণে তখন মানুষের খাদ্যতালিকায় যাবতীয় কীটপতঙ্গ ভূমিজ কিংবা জলজ ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদ এবং সব ধরনের পশুমাংস অবলীলায় অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছিল। তখন প্রয়োজনে কোনো প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগানোর কথা তো দূরস্থ, মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে রীতিমতো ভয় পেত। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত এ সব ঘটনা তাদের কাছে ভীতিজনক ব্যাপার ছিল। প্রচণ্ড দৈহিক বলে বলীয়ান ও অসাধারণ পরিশ্রমী হওয়া সত্ত্বেও নিত্যন্ত সাধারণ এক ইতর প্রাণীর মতোই তারা ভীরা ও প্রাকৃতিক শক্তির একান্ত বসংবদ ছিল। বহু ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ ঘেঁটে দেখা যায় আজ থেকে দশ হাজার বছর পূর্বে মানুষ আগুনের ব্যবহার জানলেও বনের অন্য সব পশুদের মতোই জীবন অতিবাহিত করত। তারা গুহায় বসবাস করত। আগুনে ঝলসানো পশুমাংস কিংবা ভূমি থেকে ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদ তুলে এনে আহার করত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে শিকারি-সংগ্রাহক মানুষেরা গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে বাস করত। গোষ্ঠীভুক্ত বলশালী নারী-পুরুষ দলবদ্ধভাবে শিকার অথবা সংগ্রহ করে যে খাদ্যবস্তু নিয়ে আসত তা সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হত। সে যুগের কোনো শিকারী-সংগ্রাহক নারী নিজ গোষ্ঠীভুক্ত যে কোনো পুরুষের সঙ্গেই দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারত। বস্তুত শিকারী-সংগ্রাহক মানুষদের খাদ্যাভ্যাস এবং যৌনজীবন উভয়ই প্রয়োজনভিত্তিক এবং স্বাধীন ছিল। বর্তমান সময়ের সভ্য মানুষ যে প্রাগৈতিহাসিক গোষ্ঠীনির্ভর সমাজ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে তা অবিশ্বাস করে। তাদের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। কারণ আধুনিক মানুষ ব্যক্তিগত সম্পদ ভোগ করে ও একজন নারী কিংবা পুরুষের সঙ্গেই সারা জীবন সহবাস করে। এখন তারা আর ভ্রমণশীল জলবায়ুসচেতন ক্ষিপ্রগতি শিকারী-সংগ্রাহক মানুষ নেই। এখন তাদের খাদ্যাভ্যাস বৈচিত্র্যহীন। কীটপতঙ্গ কিংবা স্বয়ম্ভু ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ ও বনচারী অজস্র পশুপাখী তাদের খাদ্য তালিকার বাইরে নিষ্ক্ষিপ্ত।

এখন তারা প্রকৃতির অসীম অধ্যবসায়ের নির্মিত পাহাড়ের কোনো গুহায় বাস করবার বদলে আপন বাহুবলে বাসস্থান নির্মাণ করে। ধর্মনীতি ও সমাজনীতি বহুগামী যৌন সম্পর্কের পক্ষে এখন এক বিশেষ বাধাস্বরূপ। ধর্ম, সামাজিক অনুশাসন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সব মিলিয়ে এখন মানুষের চারদিকে যেন অদৃশ্য কারাগারের আকাশচুম্বি দেওয়াল উঠে গেছে। সমরেশ বসুর ‘উরাতিয়া’ গল্পে আমরা সেই কৃত্রিম দেওয়ালগুলোকে যেন একে একে ভেঙে পড়তে দেখি।

‘উরাতিয়া’ গল্পে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বেশ কয়েকবার উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগে মানুষের প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিতও উপমার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। গল্পের প্রধান চরিত্র লাখপতি আর ঘামারি দুই বন্ধু। একটি রেলওয়ে ক্রসিং গেটের দু-পারের দুই প্রহরী। সেই রেল লাইনের ধারেই তাদের থাকবার ঘর। কিন্তু এগুলো মামুলি তথ্য। আসল কথা তারা হল মস্ত মল্লবীর। চাকরি ছাড়া তাদের হাতে আর যে কয়েকটি নিত্য কর্ম অবশিষ্ট থাকে তার মধ্যে অন্যতম হল একে অন্যের সঙ্গে প্রতি দিন মল্লযুদ্ধে প্রতিযোগিতা করা। দিনে মাত্র বারকয়েক নিশান দেখানো তাতে কতটুকু আর সময় লাগে। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা দেহচর্চার মাধ্যমে কাল কাটায়। ঐ দেহচর্চা এবং মল্লযুদ্ধই তাদের জীবনের একমাত্র নেশা। দিনের অধিকাংশ সময় হয় তারা মল্লযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়, নতুবা দেহের বিভিন্ন স্থানে ফুলে থমকে থাকা নিজেদের পেশিগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। সন্ধ্যা কালে লড়বার আগমুহুর্তে তাদের দেহের প্রত্যেক শিরা-উপশিরায় রক্ত চাঞ্চল্য অনুভূত হয়। কে যেন ভিতর থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাদের লড়াইয়ের আখড়ায় ঠেলে পাঠায়। রেলওয়ে ক্রসিং গেটটার আশেপাশের প্রান্তর জনহীন। সেখানে দিনে এবং রাতে শুধু ঝাঁঝ পোকের ডাক শোনা যায়। বড়ো বড়ো উদ্ভিদশূন্য একপেশে উঁচুনিচু জমি মাইলের পর মাইল জুড়ে শায়িত। সেই রেল লাইনের এক দিকের উঁচু জমি হল লাখপতি আর ঘামারির মল্লক্ষেত্র। রোজ ঐ মল্লক্ষেত্রে সূর্যাস্ত অবধি তারা লড়াইয়ের মহড়া দেয়। রোজ লাখপতি আর ঘামারি যখন মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন দূর থেকে তাদের ঠিক যেন দুটো বিশালাকার প্রাগৈতিহাসিক দানবের মতো দেখায়। প্রসঙ্গত লাখপতি আর ঘামারি মনুষ্যমূর্তি ধরে দাঁড়ালেও গল্পের কথক তাদের কিন্তু মনুষ্যশ্রেণিভুক্ত করতে চাননি। কার্যত তারা উভয়ই রেলওয়ে ক্রসিং গেটের প্রহরী। প্রত্যেক মাসে শহরে যায় বরাদ্দ মাইনে আনতে। তারা প্রহরীদের জন্য নির্ধারিত দুটি ঘরে বাস করে। তাদের দুজনেরই একটি করে গরু আছে, রান্নার প্রয়োজনে একটি করে উনুন আছে। মল্লবীরদের বাসস্থান থেকে নিকটবর্তী গ্রামের দূরত্ব কয়েক মাইল হলেও, মনুষ্যসুলভ জীবন ধারণের অভ্যন্তরীণ প্রেরণায় তাদের প্রায়শই গ্রামের দিকে যেতে হয়। তা ছাড়া, মনুষ্যসৃষ্ট ভাষায় তারা কথা বলে এবং তারা মানুষের মতোই দ্বিপদ প্রাণী। অথচ গল্পের কথক মল্লবীর লাখপতি আর ঘামারিকে গোরিলা, ভল্লুক, অজগর প্রভৃতি ইতর প্রাণীর সঙ্গে প্রায়ই তুলনা করে থাকেন। এই প্রাণীগুলি প্রচণ্ড দৈহিক বলের অধিকারী। হিংস্রতা ও নৃশংস আচরণে এদের জুড়ি মেলা ভার। উপরন্তু এদের দুর্দান্ত পেশিশক্তি ও দৈর্ঘ্য আর প্রস্থে অসামান্য দৈহিক গড়ন সমস্ত পশুসমাজে ভীতির সঞ্চার করে থাকে। এমনিতে লাখপতি এবং ঘামারি স্বভাবে শান্তিপ্ৰিয় হলেও, মল্লভূমিতে যেন তারা উক্ত বন্য পশুদের মতোই আচরণ করে। তখন শুধু দূর থেকে দেখা যায় তাদের যুদ্ধরত দুটি ক্ষিপ্ত ভল্লুকের মতো দৈহিক শক্তি আর ক্ষিপ্ৰগতি চাল।

এমনি করে দিন যায়। লাখপতি আর ঘামারি নির্দিষ্ট সময়ে রোজ নিশান দেখায়। রোজ সন্ধ্যা থেকে রাত্রি পর্যন্ত মল্লযুদ্ধে যোগ দেয়। তারপর একই সঙ্গে আহরাদি সমাধা করে নিজেদের ঘরে ঘুমোতে যায়। মল্লবীরদের দৈনন্দিন জীবন অত্যন্ত সরল। তাদের ব্যক্তিত্বেও এমন কোনো জটিলতা নেই যে তাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রেখে বিশ্লেষণ করবার দরকার পড়ে। কিন্তু নিজেদের দেহগুলিকে ঘিরে মল্লবীরদের মনে সর্বক্ষণ যে ধরনের মোহ বিরাজ করে, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভালো বন্ধু হলেও লাখপতি আর ঘামারি যখন নির্দিষ্ট জমিটার উপরে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন একে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই জানে। তখন তারা পরস্পর পরস্পরকে পরীক্ষা করে। উভয়ই উভয়ের পেশিশক্তি এবং লড়াইয়ের মারপ্যাঁচ বুঝে নেয়। অবশ্য তাতে তেমন লাভ হয় না। মল্লযুদ্ধকালীন কৌশলগত দক্ষতায় তারা উভয়ই সমান পারদর্শী। প্রাগৈতিহাসিক যুগে শিকারি-সংগ্রাহক মানুষকে প্রায় প্রত্যহই সিংহ বা নেকড়ে বাঘের মতো হিংস্র পশুদের মুখোমুখি হতে হত। প্রচণ্ড দৈহিক বল মানুষকে বিশেষত এ রকম হিংস্র পশুদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সংঘর্ষকালে সহায়তা করত। দৈহিক গড়নের দিক থেকে প্রাগৈতিহাসিক লাখপতি আর ঘামারিও প্রত্যেক দিন লড়াই করে। তবে কোনো হিংস্র পশুর বিরুদ্ধে

নয় তাদের নিজেদের মধ্যে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ ছিল সমতাবাদী। খাবার থেকে আরম্ভ করে যৌন সম্পর্ক সবই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হত। এ দিকে লাখপতি ও ঘামারির কিছু পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলেও তার প্রতি প্রায় দশ বছর তারা অনিহা প্রদর্শন করে এসেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষদের মতো এত দিন তারা খাদ্যসম্পদ পরস্পরের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, দুই মল্লবীর লাখপতি এবং ঘামারি কৃষিবিপ্লব পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগের মানুষ হয়েও কিছু ক্ষেত্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষদের মতো সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত ছিল।

এমন সময় লাখপতির স্ত্রী উরাতিয়ার আবির্ভাব ঘটে। উরাতিয়া সমাজস্বীকৃত আচার-আচরণে একেবারে ঐতিহাসিক যুগের মেয়ে। ব্যক্তিগত সম্পদের প্রতি মোহও ছিল তার যথেষ্ট। কিন্তু মানসিকভাবে সেও প্রাগৈতিহাসিক গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের নিয়মে আবদ্ধ। ডারউইনের বিবর্তনবাদ এক কালে শুধু সমস্ত ধরনের প্রাণীর দেহ ও মস্তিষ্কের বিচিত্র আকৃতি ব্যাপারে মানুষের কৌতূহল নিবৃত্ত করত। কিন্তু এখন মানুষের মন কীভাবে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হল সে বিষয়েও বিবর্তনবাদ অনেক তথ্য প্রদান করতে সক্ষম। বিবর্তনবাদের যে শাখা মানুষের মন ও দৈনন্দিন ব্যবহার সম্বন্ধে ধারাবাহিক অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে তাকে বিবর্তনী মনোবিজ্ঞান (evolutionary psychology) বলে অবহিত করা হয়। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম এডওয়ার্ড উইলসন মানুষের মন সম্পর্কে ধারণা লাভের প্রয়োজনে ডারউইনের বিবর্তনবাদকে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন। উইলসনের মতে, মানুষের দেহের মতো তার মনও সময় ও পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং মানব দেহের মতো একটু অনুসন্ধান করলে মানব মনের সৃষ্টিরহস্য এবং তার বিবর্তনের ইতিহাসও অবশ্যই খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। আর তা সম্ভব হলে আজকের আধুনিক মানুষের চিন্তা ও দৈনন্দিন ব্যবহারে অবশ্যই কোনো না কোনো বিবর্তনবাদী সামঞ্জস্য পাওয়া যাবে। বিবর্তনবাদী তত্ত্বের সহায়তায় মনের প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনই বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এখন দেখা যাক ‘উরাতিয়া’ গল্পটি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা কী।

লাখপতি এবং ঘামারির মন মানুষের তৈরি করা সামাজিক নিয়মে আবদ্ধ। তবু লড়াইয়ের সময় তাদের মন সে নিয়মের তোয়াক্কা করে না। তার যুগসঙ্গিত বর্বরতা যেন ফেটে পড়তে চায়। লাখপতি ও ঘামারির জীবনে উরাতিয়ার আগমনে যেন বাহ্যিকভাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগ গিয়ে ঐতিহাসিক যুগের সূচনা ঘটল। ব্যক্তিগত সম্পদের বোধ জেগে উঠল তাদের মনে। হাঁড়ি ভাগ হল। এবার লাখপতি এবং ঘামারির মন প্রতি দিন মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার কোনো একটি অর্থ পেল। এত দিন মল্লবীরেরা শুধু দৈনিক শক্তির নেশায় যুদ্ধ করেছে। কিন্তু এবার ব্যক্তিগত সম্পদের মতো উরাতিয়ার অধিকারকে কেন্দ্র করেও তাদের মনে অসন্তোষ দেখা দিল। এ যেন আর এক নতুন ধরনের নেশা। যৌনমিলনের ঋতুতে ঠিক যেভাবে দুটি ক্ষিপ্ত ভল্লুক একটি ভল্লুকী নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়, উরাতিয়ার একচ্ছত্র অধিকার লাভের অভিপ্রায়ে দুই মল্লবীর ঠিক সেভাবেই যেন একে অন্যের প্রতি আক্রমণোদ্ভূত হয়ে উঠল। উরাতিয়ার ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাদের কাছে গৌণ বিষয়। উরাতিয়াকে জিজ্ঞেস করলে সে হয়তো বলত লাখপতি আর ঘামারি উভয়কেই সে চায়। কারণ লাখপতি তার স্বামী হলেও ঘামারি তার সঙ্গী—

সে একজনকে দিয়ে খুশী, পেয়ে খুশী আর একজনকে। লাখপতি তার ষোল আনা জীবন ও যৌবনের দেবতা। ষোল আনার হিসেবের পর যেটুকু মানুষকে করে নিঃশব্দ, বুকো আনে বল, তার সেটুকু হল ঘামারি। ঘামারি তার সহচর।^১

লাখপতি প্রাগৈতিহাসিক যুগের গোষ্ঠীবদ্ধ বর্বর কোনো যুদ্ধবাজ পুরুষের আধুনিক সংস্করণ হলে, উরাতিয়াকে অনায়াসে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত কোনো নারীর প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরা যায়। প্রাগৈতিহাসিকবিদ অনেক স্থলেই প্রাচীন গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজে পুরুষদের উপর নারীদের নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন। এমনকি আধুনিক বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানে সভ্য সমাজে নারীদের পুরুষসঙ্গী নির্বাচনের নানান শর্ত বিশ্লেষণ করেও তাতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের উপাদান খুঁজে পাওয়া গেছে। বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানীরা আধুনিক নারীর যৌন চাহিদা এবং তার নিরিখে গড়ে তোলা সচেতন সামাজিক ব্যবহার বিশ্লেষণ করে প্রাগৈতিহাসিক নারীদের মতোই খাদ্যসম্পদ, নিরাপত্তা ও শক্তিশালী জিনবাহী সন্তান লাভের নিভৃত

আকাজ্জার কথা জানিয়েছেন। একজন নারীর যৌন জীবন প্রায় সকল সময়েই সচেতন কিংবা অচেতনভাবে তার নিজের এবং তার সন্তানের নিরাপদ জীবন সুনিশ্চিতকরণে নিয়োজিত। একজন সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর এ পৃথিবীতে টিকে থাকতে পর্যাপ্ত খাবার বাসস্থান ও শক্তিশালী জিন সমস্ত কিছুই প্রয়োজন। বলা বাহুল্য যে, গোষ্ঠীবদ্ধ প্রাচীন সমাজে কোনো একজন পুরুষের পক্ষে এক সঙ্গে এই সমস্ত কিছু যোগান দেওয়া কঠিন ছিল। কাজেই এক নারীর একাধিক পুরুষসঙ্গী থাকা সে কালে স্বাভাবিক ঘটনা বলেই বিবেচিত হত। তাই প্রাগৈতিহাসিক শিকারী-সংগ্রাহক সমাজকে একভাবে মাতৃতান্ত্রিক বহুগামী সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে, পুরুষদের নারীসঙ্গী নির্বাচন পদ্ধতির বিবর্তন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে পুরুষদের কাছে পিতৃত্বের অধিকার প্রাপ্তি গুরুত্বপূর্ণ হলেও তারা নারীর যৌনতাভিত্তিক বিশ্বস্ততা দাবি করে। জনৈক গবেষকের মতে—

“men are universally worried about paternity certainty (hence, his mate's sexual fidelity is his main concern), while women are universally concerned with access to men's resources.”^২

‘উরাতিয়া’ গল্পে লাখপতি ঘামারি ও উরাতিয়া ঐতিহাসিক যুগে জন্মালেও মানসিকভাবে কিছু পরিমাণ প্রাগৈতিহাসিক। লাখপতি ও ঘামারি মল্লবীর দুজন প্রথম অবস্থায় দৈহিক শক্তি প্রয়োগে ছিল প্রাগৈতিহাসিক পশু। তখন ব্যক্তিগত সম্পদের বোধ প্রাথমিক অবস্থায় তাদের মনে দানা বাঁধতে পারেনি। তারা তখন উদ্দেশ্যহীন নেশার ঝোঁকে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হত। কিন্তু পরিস্থিতি উরাতিয়ার আগমনে সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল। পুরুষ-অধ্যুষিত উষ্ম যুদ্ধভূমিতে নারীর মানবী প্রেমের পলি পড়ল। ক্রমে ক্রমে মল্লবীরদের মনে সম্পদের মোহ জন্মাল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে নারী দেহ ভোগের লালসা। এত সব সত্ত্বেও উরাতিয়া লাখপতি ও ঘামারি উভয়কেই আমৃত্যু ভালোবেসেছিল। উরাতিয়ার মল্লবীর দুজনকে নিঃশর্ত ভালোবাসা বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানে হয়তো অবচেতনশায়ী অতিরিক্ত সম্পদ ও স্বাস্থ্যকর জিনবাহী সন্তানের নিতান্ত কোনো জৈবিক বাসনা হিসেবে গণ্য হবে। অথচ মানুষের ব্যবহারিক জীবনে মোহশূন্য ভালোবাসা হল মানবিক গুণ। উরাতিয়া গল্পে সমরেশ যেন জৈবিক আকাজ্জার উর্ধ্বস্থিত সর্বোপরি সেই মানবিক গুণেরই জয়গান করেন।

Reference:

১. বসু, সমরেশ, 'উরাতিয়া', সমরেশ বসু রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্প), আনন্দ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ. ৭৯৫
২. Ryan Christopher And Jethá, Cacilda, Sex at dawn The prehistoric origin of modern sexuality, Harper, 2010, New York, p. 142